e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ৭ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | নভেম্বর ২০১৫

জানা অজানা

ফোকলা মাছ দেখা যায় না

মাছেদের দাঁত পড়ে না। দেখা গেছে বয়স যতই হোক না কেন, তাদের দাঁতের পাটি থাকে অক্ষত। সবচেয়ে বড় কথা, জীবনকালে দু একটা দাঁত যদিও বা কোনও কারণে খসে পড়ে যায়, অমনি সেই শূন্যস্থানে নতুন দাঁত গজিয়ে ওঠে। ফলে, ফোকলা মাছ না কি দেখা যায় না সহজে। বিজ্ঞানীরা তো তাই বলছেন। আর এ কথা বলেই তাঁরা থেমে নেই। মাছের খসে পড়া দাঁতের যায়গায় নতুন দাঁত কী করে আবার বিকশিত হয়, সেই রহস্য সমাধানে তাঁরা গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। কারণ, আখেরে লাভ মানুষেরই।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, দেখা গেছে, ৬০ বছর হতে না হতেই ৩০ শতাংশ মানুষের কিছু দাঁত খোয়া যায়। সে যায়গায় আর নতুন দাঁত গজায় না। শূন্যস্থান ভরাট করতে হয় কৃত্রিম দাঁত বসিয়ে। তা না হলে খাবার চিবিয়ে খেতে অসুবিধে হয়, শুরু হয় হজমের গোলমাল। আর খাদ্যের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে না শরীর। মাছেদের সে বিড়ম্বনা নেই। প্রকৃতির ডাক্তারিতে দাঁতের বদলে দাঁত তাদের এসেই যায়।

মাছেদের দাঁত সম্পর্কে আরও দু-চার কথা জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের জিভ নেই।

এবার ২ পাতায়

ফুলে সুবাস নেই, দিগভ্রান্ত মৌমাছি

ডিজেলের ধোঁয়ায় ফুল গন্ধ হারাচ্ছে, অচেনা হয়ে যাচ্ছে মৌমাছির চেনা জগৎ

বিশ্বজুড়ে এখন ডিজেল-চালিত বাহনের বিশেষ রমরমা। ডিজেল পুড়িয়ে হাজার হাজার ছোট বড় গাড়ি, বাস, ট্রাক পৃথিবীর সড়ক, মহাসড়ক দিয়ে ছুটে চলেছে অবিরাম। রেলের হাজারও ডিজেল ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চলেছে যাত্রিবাহী ট্রেন বা মালগাড়ি। আর তারা যত চলছে ততোই তারা বাতাসে ছড়াচ্ছে ডিজেল-পোড়া ধোঁয়া। আর এই হেন যানের সংখ্যাও তো দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এবং এর ফল যে ভাল হচ্ছে না তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাতাসে বাড়তে থাকা ডিজেলের ধোঁয়া, যার মধ্যে রয়েছে বিষাক্ত নাইট্রাস অক্সাইগড গ্যাস, মানুষসহ যে কোনও প্রাণীর শরীরের পক্ষেই তা ক্ষতিকর। এমনকী গাছে ফুটে-থাকা ফুলের ক্ষেত্রেও, যার ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারি, বলছেন ইংল্যান্ডের ইউনিভারসিটি অফ সাউথহ্যম্পটন ও ইউনিভারসিটি অফ রিডিং-এর বিজ্ঞানীরা।

গবেষণায় তাঁরা দেখেছেন ডিজেলের ধোঁয়া গাছকে এতোটাই প্রভাবিত করছে যে, অনেক ফুল তাদের স্বাভাবিক চেনা গন্ধই হারিয়ে ফেলছে।

অথচ মৌমাছিরা নানা ফুলের নানা ধরনের গন্ধের ওপর নির্ভর করেই মধু আহরণে যায় তাদের চেনা ফুলের কাছে। আর সে ভাবেই তারা ঘটায় পরাগ মিলন, যার ফলে গাছে গাছে ফল ধরে, খাদ্য সৃষ্টি হয় মানুষ আর অন্য বহু প্রাণীর জন্য। কিন্তু ডিজেলের ধোঁয়া গাছের মধ্যে এমনই বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে যে ফুল হারাচ্ছে তাদের পরিচিত গন্ধ। মৌমাছির দল উড়ে বেড়াচ্ছে দিগবিদিক কিন্তু তাদের নাকে আসছে না কোনও ফুলের গন্ধ। তারা খুঁজে পাচ্ছে না তাদের চেনা ফুলের রাশি। সংগ্রহ হচ্ছে না তাদের প্রয়োজনীয় মধু। ঘাটতি দেখা দিচ্ছে পরাগ মিলনে। আর শেষমেশ হতক্লান্ত শ্রমিক মৌমাছি খালি 'হাতে'ই ফিরছে তার চাকে, যেখানে একটু একটু করে কমছে মজুত খাদ্যের ভান্ডার। আর সেই সঙ্গে বাড়ছে অনাহার, অপুষ্টি, আর তাদের মৃত্যুহার।

গবেষক রবি গারলিং বলেছেন, এক ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতেই মৌমাছিদের অবদান কয়েক লক্ষ পাউন্ড হবে। ভারতীয় টাকার হিসেবে যা হবে কয়েক শো কোটি টাকা। তারা যে কাজ নিঃশব্দে করে যায় তার জন্য তাদের কোনও টাকা দিতে হয় না মানুষকে। অথচ পৃথিবী জুড়ে তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যাচ্ছে মানুষেরই নানা কাজের ফলে।

সহ গবেষক গায় পপি বলেছেন কীটনাশকের মারাত্মক প্রভাব তো ছিলই, তার সঙ্গে এখন ডিজেলের ধোঁয়া যোগ হয়ে মৌমাছিদের আরও বিপন্ন করে তুলছে। সেই সঙ্গে কি বিপন্ন হচ্ছে না মানুষও?

সূত্র: ইউনিভারসিটি অফ সাউথহ্যাম্পটন

আর্কটিকে প্লাস্টিক, সঙ্কিত বিজ্ঞানীরা

পৃথিবীর কোনও প্রান্তই প্লাস্টিকের উপদ্রব থেকে মুক্ত নয়। এমনকী সম্প্রতি জানা গেছে যে আর্কটিক সাগরের জলেও ভাসছে প্লাস্টিকের আবর্জনা। আর তাই দেখে প্রমাদ গুণছেন বিজ্ঞানীদের একাংশ। তাঁরা বুঝতে পারছেন না কী করে ওই প্লাস্টিকের জঞ্জাল আর্কটিকের মত পৃথিবীর এক সুদূর প্রান্তে পৌঁছে গেল। কিন্তু তাঁরা বলছেন সেখানকার ভঙ্গুর পরিবেশের ওপর এর প্রভাব একেবারেই ভাল হবে না। এই বিষয়ে 'পোলার বায়োলজি' জার্নালে এক গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

অ্যালবাট্রস

গবেষকরা বলেছেন যে আর্কটিকের সামুদ্রিক পাখি আর হাঙ্গরের পেটে প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। বলা হচ্ছে উত্তর ইয়োরোপের সাগর ঘেঁষা দেশগুলি থেকে প্লাস্টিকের আবর্জনা পৌঁছে যাচ্ছে আর্কটিকে।

এবার ২ পাতায়

আর্কটিকে প্লাস্টিক

১ পাতা থেকে

পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে ভাসমান জঞ্জালের পাঁচ স্তূপ আছে। এবার ছ' নম্বরটি তৈরি হতে চলেছে বলেছেন গবেষকরা। বিবিসি-র এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রশান্ত মহাসাগরে প্লাস্টিকের আবর্জনা বেড়ে চলেছে আর তার পরিণাম হচ্ছে মরমান্তিক। বিবিসি-র সায়েন্স এডিটার ডেভিড শুকম্যান তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের মিড-অ্যাটল দ্বীপে তিনি দেখেছেন কি ভাবে সমুদ্রের অ্যালবাট্রস পাখি প্লাস্টিকের শিকার হচ্ছে। খাবারের সঙ্গে তারা প্লাস্টিকের টুকরো গিলে ফেলচে, যার ফলে মারা যাচ্ছে অনেক পাখি। দ্বীপের তীরে তিনি প্রচুর অ্যালবাট্রসের মৃত বাচ্চা দেখেছেন যাদের পেট ভর্তি প্লাস্টিকের ছোট টুকরোয়, সিগারেটের অবশেষ, ভাঙ্গা দাঁত মাজার ব্রাশে। প্লাস্টিক পচে না, গলে না। হাজার হাজার বছর ধরে থেকে যায়। কিন্তু সমুদ্রের জলের ক্রমাগত আঘাতে ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হয়, যা সহজেই সমুদ্রের প্রাণীদের পেটে চলে গিয়ে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। অন্য সমুদ্রে এই ধরনের আবর্জনা অনেক আগেই দেখা গেছে এখন পৃথিবীর মাথার কাছে অবস্থিত আর্কটিক সাগরের মতো সুদূর অঞ্চলেও প্লাস্টিকের বিপদ ছড়িয়েছে।

মাছের দাঁত

১ পাতা থেকে

তাই স্বাদবোধটা আসে দাঁতের মারফৎ। আবার অনেক মাছ যারা জলজ উদ্ভিদ গিলে খায় তাদের দাঁতই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টার জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আর ইংল্যান্ডের কিংস কলেজের বিজ্ঞানীরা দেখতে চাইছেন কোন জিন কী ভাবে প্রবীণ মাছেদের ক্ষেত্রেও নতুন দাঁত গজাতে সাহায্য করে। উদ্দেশ্য, মানুষের ক্ষেত্রেও তেমন কোনও পন্থা বার করা যায় কিনা।

সূত্রঃ নিউজওয়াইজ

এলোমেলো বর্ষা, বহুরূপী ভাইরাস

ডেঙ্গুর তান্ডব

এবছর ডেঙ্গুর উৎপাত তান্ডবে পরিণত হয়েছে। এই মশাবাহিত জ্বরের প্রকোপে কেঁপেছে ভারতের নানা দিক। দলে দলে আক্রান্ত মানুষকে সারিয়ে তুলতে হিমসিম খেতে হচ্ছে সকলকে। কেন এমন হলো? গবেষকরা বলছেন এর সঙ্গে যোগ রয়েছে বর্ষার আর পরিস্থিতি বুঝে ডেঙ্গু ভাইরাসের নিজেকে নানা রূপে হাজির করার এক অত্যাশ্চার্য ক্ষমতা।

ভারতের ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম-এর ডিরেক্টর এ সি ধারিওয়াল বলেছেন বর্ষা কেমন হচ্ছে তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে ডেঙ্গুর প্রকোপ। সাধারণত বর্ষা আসে জুন মাসে, থাকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তার মধ্যে বৃষ্টিপাত যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে ডেঙ্গুর রমরমা লক্ষ করা যায়। বৃষ্টি যদি থেকে থেকে হয় তাহলে জল জমে থাকে, আর তাতে ডেঙ্গুবাহী মশার বংশবৃদ্ধি হয় দ্রুত। কিন্তু ঝমঝমিয়ে স্বাভাবিক বৃষ্টি হলে জমা জল আটকে থাকে না, বরং বৃষ্টির তোড়ে তারা বেরিয়ে যায় আর সঙ্গে ভেসে যায় মশার ডিম আর বাচ্চা। ফলে মশার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর সেই সঙ্গে ডেঙ্গুও।

কিন্তু বলা হচ্ছে এ বছর বর্ষা ভাল হলেও বৃষ্টি হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। কিছু দিন হয়ে থেমে গেছে। কয়েক দিন বাদে আবার বৃষ্টি নেমেছে। এমনি করেই এগিয়েছে বর্ষা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। আর ওই বৃষ্টিহীন দিনগুলোতে নানা জায়গায় জমে থাকা জলে মশার বংশ বেড়েছে নিরাপদে।

শুধু যে মশার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়। বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে গুমোট গরমও। ওই আবহওয়ায় ডেঙ্গু ভাইরাসের উৎপাত অনেকটা বেড়ে যায়, এমনটাই বলা হচ্ছে। রাজধানী দিল্লি ওই কারণে এবার ডেঙ্গুর কবলে পড়ে বেশি মাত্রায়। এ ছাড়া ডেঙ্গু ভাইরাস আগের তুলনায় অনেকটা বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। মানুষের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে ওই ভাইরাস এখন চার রকম রূপ ধরেছে। যে চেনা রূপটিকে প্রতিহত করার জন্য মানুষের দেহের প্রহরী কোষেরা যখন ঢাল তলোয়ার নিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকে, তখন অন্য এক অচেনা রূপে ডেঙ্গু ভাইরাস শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। দেহের প্রহরীরা তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে না পেরে অবাধ বিচরণের অনুমতি দিয়ে দেয়। আর সেই সুযোগে সে রক্তস্রোতে মিশে গিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। আর এও দেখা যাচ্ছে যে ওই বহুরূপী ভাইরাস আক্রমণের অনেক নতুন পন্থাও আয়ত্ত করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। যার ফলে মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থাও হিমসিম খাচ্ছে তাদের ছলচাতুরির কাছে।

সূত্রঃ ডাউনটুআর্থ.ওআরজি.ইন

এক চোখ ঘুমিয়ে, এক চোখ জেগে

বিচিত্র নিদ্রা ব্যবস্থা

কুমিরদের নিয়ে বড় সমস্যা। তারা কখন ঘুমিয়ে থাকে আর কখন জেগে তা ঠাউর করা খুব মুস্কিল। কারণ তারা এক চোখ খুলে দিব্বি গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে ঘুমলেও খোলা এক চোখ দিয়ে তারা তাদের চারপাশের ওপর কড়া নজর রাখে – কে এল, কে গেল, বিপদ কাছে না দূরে – এই সবের ওপর।

তবে এও ঠিক এক মাত্র কুমিরই যে এমন জেগে ঘুমনোয় পারদর্শী তা নয়। কিছু পাখি ও জলের স্তন্যপায়ী প্রাণীও এ ব্যাপারে যথেষ্ট পটু বলে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার লা ট্রোব ইউনিভারসিটির গবেষক জন লেস্কু। এটা অবশ্য ঠিক যে কুমিরের ঘুমের এ হ্যানো ব্যবস্থা নিয়ে আগে কোনও গবেষণা হয় নি।

এক-চোখে ঘুম মানে হল প্রাণীটির মস্তিস্কের এক দিক নিদ্রাচ্ছন্ন আর অপর দিক সজাগ। মগজকে এমন নিখুঁতভাবে ভাগ করার ক্ষমতা খুব কম প্রাণীরই আছে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে দেখা গেছে শুশুক আর বটলনোজ তিমি এই ভাবে ঘুমতে পারে।

বিজ্ঞানীদের অনুমান সমুদ্রের গভীরে তারা নিজেদের সমষ্টির অন্য সদস্যদের সঙ্গে **যোগাযোগ রাখতেই ঘুমের এমন অবিনব কায়দা অবলম্বন করে। তবে কুমিরও কেন ওই ব্যবস্থা বেছে নিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।**

সূত্রঃ লাইভসায়েন্স

ক্রাউন ঈগল

মাথায় ঝুঁটির জন্যই বোধহয় তার অমন নাম। আফ্রিকার শুধু দ্বিতীয় বৃহত্তমই নয়, ঈগলদের মধ্যে সব থেকে হিংস্র বলেও মনে করা হয় তাকে। ইথিওপিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, তানজানিয়া ইত্যাদির অরণ্যাঞ্চল তাদের বিচরণক্ষেত্র। তারা সাপ, পাখি, লিজার্ড তো খায়ই, তবে তাদের ৯০ শতাংশ খাদ্যই হল বানর,অ্যান্টেলপের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীরা। এবং মাংসাশী এই পাখিটিকে অনেক সময়ই শিকার নিয়ে লেপার্ড, কুমিরদের সঙ্গে রীতিমতো লড়াল-ড়ি করতে হয়। বাসার কাছাকাছি দেখলে মানুষকেও না কি আক্রমণ করে বসে। তিন সাড়ে তিন ফিট লম্বা এই শিকারি পাখির পরমায়ু বছর ১৪। ডিম পাড়ার আগে বিশাল বাসা বানায় তারা। তাদের জন্মহার কম। প্রতি দু'বছরে ডিম পাড়ে মাত্র একটাই।

মধুর খোঁজে বেরিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে মৌমাছিরা

জেনে রাখা ভাল

মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি - এমনটা বোধহয় আর বেশি দিন বলা যাবে না। কারণ তারাও বিশেষ করে হানি বি'রা বিপন্ন'র তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে। অথচ তারাই ফুল-ফল-সবজি উৎপাদনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরাগমিলনকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ অন্য গাছপালা জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও ফুল ফোটাতে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের সম্পর্কে আরও জানা যায় যে -

● হানি বি'রা বাস করে কলোনির মধ্যে।

বসবাসকারীদের মধ্যে তিনটি ভাগ থাকে। রানী মৌমাছি, কর্মী মৌমাছি আর দ্রোণ বা পুরুষ মৌমাছি।

● রাণী মৌমাছির কাজ হল তাদের কলোনি বা বাসস্থানটি পরিচালনা করা। আর শুধু ডিম পেড়ে যাওয়া যাতে পরবর্তী প্রজন্ম আবার তৈরি হয়ে ওঠে। রানীর আরও একটা কাজ - তার দেহ থেকে এক ধরনের রাসায়নিক নির্গত হয় যা অন্য মৌমাছিদের আচরণ গাইড করে।

● কর্মী মৌমাছিরা সবাই মহিলা। তাদের কাজ ফুল থেকে পরাগ ও মধু আহরণ করা, বসতি তৈরি ও তাকে পরিস্কার রাখা, ডানা ঝাপটিয়ে ভেতরে হাওয়া চলাচল ঠিক

রাখা ইত্যাদি। চারপাশে যে মৌমাছিদের আমরা দেখতে পাই তারা আসলে এই মেয়ে বা কর্মী মৌমাছিই।

● দ্রোন বা পুরুষ মৌমাছিরা কলোণির মধ্যেই বাস করে। এবং তাদের কাজ শুধু নতুন রানী মৌমাছির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রজনন ঘটানো।

●এই হানি বি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মধু সঞ্চয় করে রাখে শীতের জন্য। আর বলা বাহুল্য আমরা সেটাই তাদের বাসা থেকে চুরি করে নিই।

● রানী মৌমাছিরা মারা গেলে কর্মী মৌমাছিরাই নতুন রানী নির্বাচন করে নেয় বাসার মধ্যে থাকা সদ্যজাত লার্ভাদের থেকে। এবং তারা সেই লার্ভাকে বিশেষ খাদ্য খাওয়ায় যাতে সে ভবিষ্যতে খুবই প্রজননক্ষম রাণী হয়ে উঠতে পারে।

● হানি বি'রা ঘন্টায় ২৫ কিমি বেগে ওড়ে। এবং ডানা ঝাপটায় সেকেন্ডে ২০০ বার। কর্মী মৌমাছিরা গড়ে ৫-৬ সপ্তাহ বাঁচে। এবং ওই জীবৎ কালে সে প্রায় ১২ চা চামচ মধু তৈরি করে।

● রানী মৌমাছি অবশ্য ৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে। এবং গরমের মাসগুলোয় সে খুবই ব্যস্ত থাকে যখন সে দিনে প্রায় ২৫০০০ ডিম পাড়ে।

● দুঃখের বিষয় গত ১৫ বছর ধরে এই মৌমাছিদের কলোনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কারণ সঠিক জানা না গেলেও দেখা যাচ্ছে যে কোটি কোটি মৌমাছি বাসা ছেড়ে বেরুলেও তারা আর কলোনিতে ফিরে অসছে না। **সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

বনে বনে আগুন জ্বলছে, আকাশে ঘন কালো ধোঁয়া

সেখানকার সমস্ত আকাশ যেন হলদেটে ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। যেখানে বাতাসের দূষণমাত্রা ৩০০ ছাড়ালেই তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়, সেখানে সেই মাত্রা ছুঁয়ে গেছে ২০০০ এরও বেশি। ফরেস্ট ফায়ার বা অরণ্যের আগুন থেকে ছড়িয়ে পড়া বিপুল বায়ু দূষণের এই ঘটনা প্রতিবছরই ঘটতে থাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এবার ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ার কালিমন্থনে বনের আগুন থেকে। আর হাজার হাজার মানুষ সেখানে ওই দূষণের শিকার হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন-জানিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী।

বিবিসি'র একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, আসলে সেখানে চাষের জন্য জঙ্গল পোড়ানোর কাজ চলছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে। তার থেকেই ঘটছে ওই বিপত্তি। যার সব থেকে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। এই দূষণের হাওয়া যখন বইতে থাকে, তখন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মানুষ জনকে সেই দূষণের হাত থেকে বাঁচতে ঘরের মধ্যে থাকতে সরকার পরামর্শ দেন। এবং বাতাসের ধূলিকণা থেকে বাঁচতে 'এফ পঁচানব্বই' মুখোশ পরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সিঙ্গাপুর থেকে একটি দল কালিমন্থনে পৌঁছেছেন। এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে প্রায় ২৫,০০০ ওই মাস্ক বা মুখোশ সঙ্গে নিয়ে গেছেন তারা।

নতুন মাকড়সা

এক নতুন প্রজাতির মাকড়সার দেখা পাওয়া গেছে। সেটি দেখা গেছে দিল্লির 'অসোলা ভাট্টি' অভয়ারণ্যে। তার বৈশিষ্ট হল সেটি লাফাতে পারে, আর তার শরীরে আছে নানা রঙের নক্সা, যা নাকি ঠাকুর জগন্নাথের মত দেখতে। তাই তার বৈজ্ঞানিক নাম রাখা হয়েছে 'স্টেনেলুরি-লাস জগন্নাথে'। বিশ্ব মাকড়সা তালিকায় তার নাম ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত করা হয়েছে।
প্রাণীটিকে আবিষ্কার করেছেন গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সঞ্জয় কেশরী দাশ ও তাঁর ছাত্ররা। এই প্রজাতির পুরুষ মাকড়সারা ৩.৭৫ মিমি লম্বা আর মেয়েরা হয় ৬.৫০মিমি। আর্থাৎ পুরুষদের থেকে প্রায় দু গুণ বড়। এবং এক দল তরুণ প্রকৃতিবিদ মুম্বাই-এর কাছে সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশনাল পার্কের গা ঘেঁষে অবস্থিত মিল্ক কলোনিতে আবিষ্কার করেছেন দু ধরনের মাকড়সা। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিক্টস মুম্বাইয়েনেসিস' আর 'পিউসেটিয়া ফন্টাসমা'।

রেড পান্ডা

রেড পান্ডা এক বিরল প্রাণী। তাদের বাঁচাতে আর তাদের সংখ্যা যাতে বাড়ে তার জন্য জোর চেষ্টা চলছে। তারই মধ্যে ডাবলিউ.ডাবলিউ.এফ সিকিমে রেড পান্ডাদের বাসস্থানের অবস্থা সম্পর্কে সাবধান করেছে। বলা হয়েছে সংরক্ষিত এলাকার বাইরে যে সব বনে তারা থাকে সেগুলির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে আর সেখানে পর্যটকদের চাপ বাড়ছে দিন দিন। তাছাড়া এক ধরনের বন্য কুকুর তাদের বাসস্থানকে বিপজ্জনক করে তুলছে।

সূত্রঃ প্রোটেক্টেড এরিয়া আপডেট

প্রাণ সৃষ্টির দিনক্ষণ আবার পেছল

পৃথিবীতে প্রাণী আছে মানে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল কোনও এক সময়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সেটা ঘটেছিল ৩৮৩ কোটি বছর আগে। কিন্তু সে ধারণা এখন পাল্টাতে বসেছে। মনে করা হচ্ছে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল আরও ২৭ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ, পৃথিবীর জন্মের ৪৪ কোটি বছরের মধ্যেই। এ গ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪৫৪ কোটি বছর আগে। মহাজাগতিক সময়ের নিরিখে বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই প্রাণের সুচনা হয়।
অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া গেছে এমন এক পাথর যা থেকে এক দল বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্ত করছেন। যে বস্তুটি মিলেছে তার নাম 'জিরকন'। পৃথিবী এক সময় খুব গরম ছিল। তরল লাভার মত ফুটত সব কিছু। তারপর সময়ের সঙ্গে ঠান্ডা হতে শুরু করল এই গ্রহ। জমাট বাঁধতে লাগল তরল পদার্থ। তৈরি হল পাথর আর মাটি। পৃথিবীর সেই একটু ঠান্ডা হওয়ার যুগেই জমে যাওয়া ধাতু থেকেই জিরকনের সৃষ্টি। অসোট্রলিয়ায় প্রাচীনতম যে জিরকনের নমুনা পাওয়া গেছে তার বয়স ৪৪০ কোটি বছর। বিজ্ঞানীরা ৭৯ জিরকনের নমুনা পরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যে একটির বয়স ৪১০ কোটি বছর। এটিতে পাওয়া গেছে গ্র্যাফাইট, যা কিনা আসলে খাঁটি কারবন। আর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সেটি আসলে জৈবিক কারবন, যা সূর্যের আলো সালকসংশ্লেসের মাধ্যমে ব্যবহার করেই তৈরি হওয়া সম্ভব। এবং তা করার ক্ষমতা থাকে কেবল উদ্ভিদের। অর্থাৎ, প্রাণ নিশ্চই এক কোষের উদ্ভিদের আকারে বিকশিত হয়েছিল সেই ৪১০ কোটি বছর আগে। বিজ্ঞানীরা এও বলছেন যে সে সময় পৃথিবীর পরিবেশ ছিল খুব গরম। অথচ তারই মধ্যে যে প্রাণের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে এটাও প্রমানিত হচ্ছে যে অত্যন্ত নির্মম ও অসহনীয় পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটতে পারে। এক ধাপ এগিয়ে তাঁরা আরও বলেছেন যে পৃথিবীর গনগনে, দমবন্ধকর পরিমন্ডলেও যদি প্রাণের বিকাশ হয়ে থকেতে পারে, তাহলে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অগনিত গ্রহের অত্যন্ত বিরূপ পরিবেশেও প্রাণের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা যায় না।
ক্যালিফরনিয়া ইউনিভারসিটির ভূবিজ্ঞানী মার্ক হ্যারিসন বলেছেন, ২০ বছর আগে এমন চিন্তা করাটাও পাগলামি বলে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, ৪১০ কোটি বছর আগে প্রাণের উন্মেষ অনেক প্রচলিত ধরণাকে বদলে দেবে।
গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার 'প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'।
সূত্র: লাইভসায়েন্স

অতীত কথা বলে

বাড়ির বয়স প্রায় ২,২০০ বছর

বাড়ির বয়স, তা নয় নয় করেও প্রায় ২২০০ বছর হবে। এবং ৩৩ ফিট লম্বা ও ৫০ ফিট চওড়া সেই বাড়িতে কিন্তু বাস করত নাহ, কোনও মানুষ নয়, উই পোকারা। তারাই ছিল বাড়ির নির্মাতাও। এখন তা পরিত্যক্ত। তবে ৮০০-৫০০ বছর আগেও নিয়মিত তার ব্যবহার হত। এবং ওই খুদে উই পোকারা নিজেদের তৈরি শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত সেই প্রাসাদ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্যবহার করে এসেছে। সম্প্রতি মধ্য আফ্রিকায় মিয়োম্বোর জঙ্গলে বিজ্ঞানীরা এই উইঢিপিটি দেখতে পান। পরীক্ষায় জানা গেছে এখনও পর্যন্ত এটিই সব

থেকে প্রাচীন উই ঢিপি।
বিবিসি'র একটি প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানীরা সেখানে ৭৫০ বছরের পুরনো আরও উই ঢিপি আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে সমাজবদ্ধ এই উইপোকারা মানুষের মতোই একই বাড়ি শত শত বছর ধরে ব্যবহার করে। বেলজিয়ামের ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও কঙ্গো গণপ্রজাতন্ত্রের লুবুম্বাসি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ওই ঢিপির মাটি নিয়ে রেডিয়োঅ্যাক্টিভ পরীক্ষা চালান। তাতেই প্রাসাদোপম ওই উই ঢিপির বয়স জানা গেছে। তাঁরা এও জেনেছেন যে, ঢিপির নিচের দিকের কক্ষগুলি অনেক আগে পরিত্যক্ত হলেও উপরের কুঠুরিগুলি পোকারা ব্যবহার করত দীর্ঘ দিন ধরে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে ২২০০ বছর আগেই বুঝি ওই প্রাচীন উই ঢিপি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক পরীক্ষায় জানা যায় ৮০০ থেকে ৫০০ বছর আগেও ওই ঢিপি পোকারা ব্যবহার করত, যখন ওই অঞ্চলে খুব গরম পড়ত তখন।

বরফ গলে যাচ্ছে, তাই সঙ্কটে পোলার বেয়ার

জন্মের সময় তার আকার থাকে মাত্র একটি গিনিপিগের মতো। কিন্তু মাত্র দু-আড়াই বছরের মধ্যেই মায়ের ছত্রছায়ায় সে পূর্ণ বয়স্ক হয়ে উঠলে, তার ওজন গিয়ে দাঁড়ায় ৪৫০- ৫০০ কেজি। কখনও কখনও তার থেকেও বেশি। বিশালদেহী স্তন্যপায়ী মাংসাশী এই প্রাণীটি বর্তমানে অন্যদের মতো শিকারের জন্য ততো নয়, বিপদ সম্মুখীণ হয়ে পড়ছে প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। উত্তাপ বৃদ্ধিতে গলে যাচ্ছে মেরু বরফ আর তাতেই তাদের বিপদ ঘনিয়ে উঠছে। তাদের মানে পোলার বেয়ার বা মেরু ভালুকদের ।

অবশ্য এক সময় তাদের প্রচুর শিকার করা হত। এবং সত্তরের দশকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত তা ছিল অব্যাহত। তারপর থেকেই সংখ্যা কমতে কমতে তারা হুমকির মুখে পড়ে। তখন এই মেরু ভালুকদের সংরক্ষণের জন্য নিয়মকানুন তৈরি হয়। সেই থেকে তাদের শিকার করা কমেছে। তবে বরফের রাজ্যের বাসিন্দারা ক্রমশ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে বরফ গলতে থাকায়।

আসলে মেরু প্রদেশে জমাট সমুদ্রের বুকেই তাদের চলাফেরা, বসবাস, তাদের শিকারক্ষেত্র। এমনকী ওই বরফের বুকে গড়াগড়ি খেয়েই নিজেদের ধোওয়া মোছা বা সাফ সুতরোও করে নেওয়া। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মেরু সাগরের সেই বরফই এখন প্রতি বছর আগে আগে গলে যায় আর জমে দেরি করে। ফলে তাদের শিকারের সময় ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাদের শরীরে অসময়ের জন্য জমিয়ে রাখা চর্বির ভাঁড়ার খালি থেকে যাচ্ছে এবং আকারে ছোট হচ্ছে ভালুক ছানারাও।

মনে করা হয় তাদের ঘনিষ্টতম আত্মীয় বাদামি ভালুকদের থেকে কয়েক

বিপন্ন যারা

কোটি বছর আগে এই মেরু ভালুকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যন্ত তুষার রাজ্যের এই অধিবাসীদের প্রকৃত সংখ্যা জানা মুস্কিল। তবে বিজ্ঞানীদের মতে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার মেরু ভালুকরা ছড়িয়ে আছে পুরো মেরু অঞ্চলে - নরওয়ে, ডেনমার্ক, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ইত্যাদি দেশে। অবশ্য উত্তর কানাডাতেই আছে তাদের অর্ধেকের বেশি।

দেখা গেছে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মেরু ভালুকের ওজন গড়ে ৪৫০ কেজি হলেও কারও কারও আবার হয় ৬০০-৭০০ কেজি পর্যন্ত। লম্বা হয় তারা প্রায় ৮-১০ ফিট। মেয়ে ভালুকের ওজন অবশ্য পুরুষদের অর্ধেক এবং লম্বাতেও তারা

৬-৮ ফিটের বেশি হয় না।

আপাতদৃষ্টিতে তাদের লোম সাদা মনে হলেও লোম আসলে রঙহীন স্বচ্ছ। কিন্তু আলোর প্রতিফলন ঘটে তাদের লোম বরফের মতো সাদা দেখায়। তাদের চামড়ার রঙ কিন্তু কালো। ওই তুষার রাজ্যে মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট'র মতো কঠীন ঠান্ডাতেও শরীরের ঘন লোমই তাদের রক্ষাকবচ।

মেরু ভালুকরাখুব ভাল সাঁতারু। তাদের ঘ্রাণ শক্তিও প্রখর। এক কিলোমিটার দূর থেকেও বরফের নিচে থাকা তাদের প্রধান খাদ্য সিলের অবস্থান তারা ঠিক টের পেয়ে যায়। মাছও শিকার করে তারা সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময়। তারা জীবনের বেশিরভাগ সময় সমুদ্রেই কাটায়। তাই তাদের 'সি বেয়ার'ও বলা হয়। প্রতি তিন বছরে একবার সন্তান প্রসব করে মা ভালুকরা যখন তারা হাইবারনেশন বা শীতঘুমে যায়। সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে তারা গড়ে বছর ২৫ বাঁচে। তবে চিড়িয়াখানায় তারা বাঁচে আরও বেশি।

মেরু প্রদেশের সব অধিবাসীদের কাছেই একদা মেরু ভালুকের চাহিদা ছিল খুব। রাশিয়াতে তো সেই ১৪০০ শতাব্দী থেকেই পোলার বেয়ারের লোমের ব্যবসা চালু ছিল। এবং ওই অঞ্চলে মানুষ যত বেড়েছে ততোই বেড়েছে সেখানে ভালুক শিকার। কারণ একমাত্র লিভার ছাড়া তাদের শরীরের লোম থেকে শুরু করে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই কোনও না কোনও ভাবে মানুষের কাজে লাগে। দেখা গেছে বছরে একই জায়গা থেকে শিকারিরা এমনকী ৪০০-৫০০ পর্যন্ত মেরু ভালুক শিকার করেছে। শিকার হতে হতে তারা যখন বিপদ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল তখনই যেন টনক নড়ে ওই পাঁচটি দেশের, যেখানে মেরু ভালুকদের বসবাস। তারপর থেকে শিকারে নিয়ন্ত্রণ, নিষেধ আরোপ ইত্যাদি। কিন্তু শিকার পুরোপুরি বন্ধ হয় নি।

তবে শিকারের থেকেও মেরু ভালুকদের কাছে এখন বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সেখানে দ্রুত বরফ গলার ঘটনা। কারণ এতে তাদের খাদ্যে বিপুল টান পড়ছে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে তাদের বসতি অঞ্চলে তেল ও গ্যাসের সন্ধানে খনন কাজ, যোগ হচ্ছে দূষণ। তাই মার্কিন ভূ-বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মেরু ভালুকই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সূত্রঃডবলিউডবলিউএফ, উইকিপিডিয়া

দেওয়াল লিখন

পৃথিবীর মাত্র ১% মানুষের হাতে বিশ্বের ৫০% সম্পদ চলে যাবে আগামী বছর

অক্সফ্যাম রিপোর্ট

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: November 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● গরিলাদের মানুষের মতোই ঠান্ডা লাগে এবং অন্যান্য অসুখও হয়।

● বেড়ালরা মাত্র ৭০০০ বছর হল মানুষের সঙ্গে বাস করছে, তবে কুকুর মানুষের সঙ্গী ১৪,০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

● হামিংবার্ডরা প্রতি সেকেন্ডে ৬০ - ৮০ বার ডানা ঝাপটাতে পারে।

● দেখা গেছে জীবজন্তু যারা পোষে, তাদের শতকরা ৭৯ শতাংশই তাদের পোষ্য প্রাণীটির সঙ্গে রাতে ঘুমোয়।

● ডেনমার্কে যত মানুষ, শুয়োরের সংখ্যা তার দ্বিগুণ ।

● জিরাফের গলা যত লম্বাই হোক না কেন, মানুষের গলার থেকে জিরাফের গলার হাড় কিন্তু একটাও বেশি থাকে না।

ইঁদুর, ১২.৫ কোটি বছর আগের

পাওয়া গেছে এক গুচ্ছ চুল। তবে তা ১২.৫ কোটি বছর পুরনো। কোনও এক প্রাণীর শরীরের অঙ্গ ছিল তা সেই সময়ে। এখন জীবাশ্ম বা ফসিলে পরিণত হয়েছে। চুলের ফসিলটি পাওয়া গেছে স্পেনে। এ কথা জানিয়েছেন মাদ্রিদ, বন আর শিকাগো ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা।

কেমন ছিল সে প্রাণীটি, যার ১২.৫ কোটি বছর পুরনো চুলের নমুনা মিলেছে সম্প্রতি **(ছবি)?** সে ছিল স্তন্যপায়ী জীব। আকারে ইঁদুরের থেকে একটু বড়। আর সে থাকত সেই যুগে, যখন পৃথিবীজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়প্রমাণ ডাইনোসরেরা। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও রাজ করেছে তার মতো করে।

বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন ‘স্পিনোলেসটেস জেনারথ্রোসাস’। প্রাণীটি ক্ষুদে হলে কী হবে, দেখা যাচ্ছে তার নামটি তার চেয়ে ঢের বড়। তবে শুধু যে তার চুলই রয়ে গেছে তা নয়। তার প্রায় গোটা শরীরটাই ফসিল হয়ে রয়ে গেছে কোটি কোটি বছর ধরে। যা দেখেই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন সে কেমন দেখতে ছিল। প্রাণীটির ছোট ছোট দাঁতগুলিও অক্ষত রয়েছে ফসিলে। সেগুলির বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রাণীটি মাটিতে থাকত আর পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচত।

সূত্রঃ ইউনিভারসিটি অফ শিকাগো প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কুইজ?!?!

১। হিপোপটেমাস হচ্ছে জলহস্তি, কিন্তু হিপোক্যাম্পাস কি?
(ক) মানুষ আর অন্য সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর মগজের অংশ (খ)বাচ্চা জলহস্তির ল্যাটিন নাম (গ) হিপিদের উপনিবেশ (ঘ) ডাঙাতে অনেক জলহস্তি যেখানে একসঙ্গে ঘুমোয়

২। এদের মধ্যে কোনটি আলাদা এবং কেন?
(ক) ধনিরাজ (খ) দুধরাজ (গ) গন্ধরাজ (ঘ) মনিরাজ

৩। এদের মধ্যে কোনটি আলাদা এবং কেন?
(ক) কেওড়া (খ) হেঁতাল (গ) গর্জন (ঘ) ফনিমনসা

৪। ভ্যালেন্টিনা তেরোস্কভা সম্বন্ধে কোনটি সত্য নয়?
(ক) প্রথম মহিলা যিনি মহাকাশে গিয়েছিলেন?
(খ) তাঁর মহাকাশযান ভস্তক ৬ দুই দিন ২২ ঘন্ট ৫০ সেকেন্ডে এ ৪৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিল (গ) উৎক্ষেপন’এর তারিখ ১৬ জুন ১৯৭৩ এ (ঘ) সাত কিমি ওপর থেকে প্যারাসুটে করে পৃথিবীতে ফিরেছিলেন

৫। আলোকবর্ষের হিসেবে কি মাপা হয়?
(ক) সময় (খ) দূরত্ব (গ) উজ্জ্বলতা (ঘ) ওজন

৬। পুরোপুরি রাজ্য হবার আগে নাগাল্যান্ড কার অংশ ছিল?
(ক) মনিপুর (খ) মায়ানমার (গ) মেঘালয় (ঘ) অসম

৭। এর মধ্যে কোন মেলা টি স্থান পরিবর্তন করে?
(ক)পুষ্কর (খ) শোনপুর (গ) কুম্ভ (ঘ) সূরজকুন্ড

৮। এদের মধ্যে কোন দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সব থেকে কম?
(ক) মরোক্কো (খ) ঘানা (গ) থাইল্যান্ড (ঘ) শ্রী লঙ্কা

৯। এদের মধ্যে কে আলাদা এবং কেন?
(ক) সানিয়া মিরজা (খ) জাওলা গুট্টা (গ) পি ভি সিন্ধু (ঘ)সানিয়া নেওয়াল

১০। কোন শারীরিক অবস্থার আর এক নাম হানসেন’র অসুখ?
(ক) কুষ্ঠ (খ) গ্যাঙ্গরিন (গ) এগজিমা (ঘ) ডায়বেটিস।

উত্তর : ১/ক; ২/গ এটি ফুল, অন্যেরা বিষাক্ত সাপ; ৩/ঘ এটি ছাড়া বাকিদের সুন্দর বনে দেখা যায়; ৪/গ, হবে ১৯৬৩; ৫/খ ; ৬/ঘ; ৭/ গ; ৮/ক, কারণ এটি অন্যগুলির থেকে অনেক শুকনো জায়গা, কাজেই মশার বংশবিস্তারের উপযোগী নয়; ৯/ইনি টেনিস খেলেন বাকিরা ব্যাটমিন্টন; ১০/ক।

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com